এ-বাড়ি ও-বাড়ি

BANGLADARSHAN.COM

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥এ-বাড়ি ও-বাড়ি॥

কে ব ল দূ র থেকে জগৎটাকে দেখে চলার অবস্থাটা কখন যে পেরিয়ে গেলেম তা মনে নেই। আমাদের বাড়ির পাশেই পুরোনো বাড়িতে প্রহরে প্রহরে একটা পেটা-ঘড়ি বাজত বরাবরই এবং ঘড়ির শব্দটাও এ-তল্লাটের সবার কানে পৌঁছত, কেবল আমারই কাছে তখন ঘড়ির শব্দ বলে একটা কিছু ছিল না। এমনি বাড়ির মানুষদের বেলাতেও—এপারে আমি ওপারে তাঁরা। অপরিচয়ের বেড়া কবে কেমন করে সরল—সেটা নিজেই সরালেম কি রামলাল চাকর এসে ভেঙে ফেলে দিলে সেটা, তা ঠিক করা মুশকিল।

রামলাল আসার পর থেকে অন্দরের ধরাবাঁধা থেকে ছাড়া পেলেম! বাড়ির দোতলা একতলা এবং আস্তে আস্তে ও-বাড়িতেও গিয়ে ঘুরিফিরি তখন, চোখ-কান-হাত-পা সমস্তই যখন আশপাশের পরিচয় করে নিচ্ছে, সে-বয়েসটা ঠিক কত হবে তা বলা শক্ত—বয়েসের ধার তখন তো বড়ো একটা ধারি নে, কাজেই কত বয়স হল জানবারও তাড়া ছিল না। এই যখন অবস্থা, তখন কতগুলো শব্দ আর রূপ একসঙ্গে, যেন দূরে থেকে এসে আমার সঙ্গে পরিচয় করে নিতে চলেছে দেখি। জুতো, খড়ম, খালি-পা জনে জনে রকম রকম শব্দ দেয়। তাই ধরে প্রত্যেকের আসা-যাওয়া ঠিক করে চলেছি। দাসী চাকর কেউ আসছে, কেউ যাচ্ছে—কাঠের সিঁড়িতে তাদের এক-একজনের পা এক-একরকম শব্দ দিয়ে চলেছে। এই শব্দগুলো অনেক সময় শাস্তি এড়ানোর পক্ষে খুব কাজে আসত। বাবামশায় লাল রঙের চামড়ার খুব পাতলা চটি ব্যবহার করতেন। তাঁর চলা এত ধীরে ধীরে যে অনেক সময়ে হঠাৎ সামনে পড়তেম তাঁর। একদিনের ঘটনা মনে পড়ে। সিঁড়ির পাশেই বাবামশায়ের শয়ন-ঘর, আমি সঙ্গী কাউকে হঠাৎ চমকে দেবার মতলবে দু'খানা দরজার আড়ালে লুকিয়ে আছি, এমন সময়ে দেয়ালে ছায়া দেখে একটা হুংকার দিয়ে যেমন বার হওয়া দেখি সামনেই বাবামশায়। এখনকার ছেলেদের হঠাৎ বাবা দাদা কিংবা আর-কোনো গুরুজনের সামনে এসে পড়াটা দোষের নয়, কিন্তু সেকালে সেটা একটা ভয়ংকর বেদস্তুর বলে গণ্য হত। সেবারে আমার কান আমাকে ঠকিয়ে বিষম মুশকিলে ফেলেছিল।

এমনি আর-একটা শব্দ পাখিরা জাগার আগে থেকেই শোবার ঘরে এসে পৌঁছত। ভোর চারটে রাত্রে, অন্ধকারে তখন চোখ দুটো কিছুই দেখছে না অথচ শব্দ দিয়ে দেখছি—সহিস ঘোড়ার গা মলতে শুরু করেছে, শব্দগুলোকে কথায় তর্জমা করে চলত মন অন্ধকারে—গাধুসনে গাধুসনে, চটপট, হঠাৎ খাটখোট চাবকান পঠাৎ পঠাৎ, গাধুস্ গাধুস্ খাটিস খাটিস চটপট। এই রকম সহিসে ঘোড়ায়, সহিসের হাতের তেলোতে, ঘোড়ার খুরে মিলে কতকগুলো শব্দ দিয়ে ঘটনাকে পাচ্ছি। এমনি একটা গানের কথা আর সুর দিয়ে পেয়ে যেতেম সময়ে সময়ে একজন অন্ধ ভিখারীকে। লোকটি চোখের আড়ালে, কিন্তু গানটা ধরে আসত সে নিকটে একেবারে তিনতলায় উঠে। ভিখারীর গানের একটা ছত্র মনে আছে এখনো—'উমা গো, মা তুমি জগতের মা, ওমা কি জন্যে তুমি আমায় মা বলেচো!' সন্ধেবেলায় খিড়কির দুয়োরে একটা মানুষ এসে হাঁক দেয়—'মুশকিল আসান।' কথাটার অর্থ উলটো বুঝতেম—ভয়ে যেন হাত-পা কুঁকড়ে যেত; গা ছমছম করত আর সেইসঙ্গে পাকা দাড়ি, লম্বা টুপি, ঝাপ্পা-ঝোপ্পা কাপড়-পরা ভুতুড়ে একটা চেহারা এসে সামনে দাঁড়াত দেখতেম। বেলা

BANGLADARSHAN.COM

তিনটের সময় একটা শব্দ—সেটা সুরেতে মানুষেতে একসঙ্গে মিলিয়ে আসত—'চুড়ি চাই, খেলোনা চাই'—এবারে কিন্তু মানুষটার চেয়ে পরিষ্কার করে দেখতে পেতেম—রঙিন কাচের ফুলদান, গোছাবাঁধা চুড়ি, চীনে-মাটির কুকুর বেড়াল।

বরফওয়ালার হাঁক, ফুলমালির হাঁক এমনি অনেকগুলো হাঁক-ডাক এখন শহর ছেড়ে পালিয়েছে এবং তার জায়গায় মোটরের ভেঁপু, ট্রাম-গাড়ি হুস-হাস, টেলিফোনের ঘণ্টা এসে গেছে শহরে।

কোন্ বয়স থেকে দেখাশোনা আরম্ভ, কখনই বা শেষ সে-হিসেব বেঁচে থাকতে কষে দেখার মুশকিল আছে, তবে জনে জনে দেখাশোনার প্রভেদ আছে বলতে পারি। আমাদের পুরোনো বাড়িতে পেটা-ঘড়িটা বাজতে শুনতে পেলেম তখন তার বাজনের হিসেবের মজাটা দেখতে পেলেম। সকালে উপরো-উপরি ছ'টা, সাতটা, সাড়ে সাতটা বাজিয়ে ঘড়িটা থামত। তার পরে আটটা ন'টা দু'ঘণ্টা ফাঁক। ফের উপরো-উপরি দশ আর সাড়ে দশ বাজিয়ে স্নান আহার করে যেন ঘুম দিলে ঘড়িটা দুপুরবেলায়। উঠল বিকেল চার ও পাঁচ বাজিয়ে! ঘড়ির এই রকম খামখেয়ালি চলার অর্থ তখন বুঝতাম না। সকালের ঘড়ি—ঘুম ভাঙাবার জন্যে, সাতটার ঘড়ি উপাসনার জন্যে, সাড়ে সাত হল মাস্টার আসার, পড়তে যাবার ঘড়ি। দশ, স্নানাহারের; সাড়ে দশ, ইস্কুল ও আপিসের; চার বৈকালিক জলযোগের, কাজকর্ম ও কাছারি বন্ধের; পাঁচ, হাওয়া খেতে যাবার। ঘুমোতে যাবার ঘণ্টা একটা, দশটা কি ন'টায় বোধহয় বাজত না—কেননা তখন ঠিক ন'টা রাত্রে কেল্লা থেকে তোপ দাগা হত আর আমাদের বৈঠকখানায় ঈশ্বরদাদা 'বোম্‌কালী' বলে এক হুংকার দিতেন, তাতেই পেটা-ঘড়ির কাজ হয়ে যেত। বেলা একটার তোপ পড়লেই করকর ঘরঘর ঘড়ির চাবি ঘোরার ধূম পড়ত বাড়িতে, ও-সময়টাতেও পেটা-ঘড়ির দরকারই হত না। এই ঘড়ির হুকুমে দেখি বাড়ির গাড়ি-ঘোড়া চাকর-বাকর ছেলেমেয়ে সবাই চলে, হাঁড়ি চড়ে হাঁড়ি নামে, মাস্টারমশাই বই খোলেন বই বন্ধ করেন।

BANGLADARSHAN.COM

ও-বাড়ির এই পেটা-ঘড়িটাকে এক-একদিন দেখতে চলতেম। পুরোনো বাড়ির উঠানের দাওয়ায় উঠতে বাঁ-ধারে একটা খিলেনের মাঝে ঝোলানো থাকত ঘড়িটা। দেখতেম শোভারাম জমাদার সেখানটাতে বসে ময়দা ঠাসছে—চকচকে একটা লোটা হাতের কাছেই রয়েছে, থেকে থেকে সেটা থেকে জল নিয়ে ময়দার নুটিগুলো ভিজিয়ে দিচ্ছে আর দু'হাতের চাপড়ে এক-একখানা মোটা রুটি ফসফস গড়ে ফেলছে। বেশ কাজ চলছে, এমন সময় শোভারাম হঠাৎ রুটি-গড়া রেখে, ঘড়িটাকে মস্ত একটা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে ঘা কয়েক পিটুনি কশিয়ে কাজে বসে গেল। দেখে দেখে আমার ইচ্ছে হত রুটি গড়তে লেগে যাই; আবার তখনই ঘড়িটা বাজিয়ে নেবার লোভ জন্মাত। হাতুড়িটায় হাত দেওয়া মাত্র জমাদারজী ধমকে উঠত—নেহি, কর্তা মহারাজ খাপ্‌পা হোয়েঙ্গে।

কর্তা মহারাজ, কে তিনি, জানবার ভারি ইচ্ছে হত। তখন কর্তাদাদামশায় দোতলার বৈঠকখানায় থাকেন, তাঁর ঘরের দরজায় কিনুসিং হরকরা—উর্দি পরে বুকে 'ওয়ার্সস্ উইল উইন' আর হাতির পিঠে নিশেন চড়ানো

তক্‌মা ঝুলিয়ে, মোটা রুপোর সোঁটা হাতে টুলে বসে পাহারা দেয়, হাতে একটা পেনসিল-কাটা ছুরি, কর্তাকে সহজে দেখার উপায় নেই।

দেখতেম কর্তা পাহাড় থেকে ফিরে যে ক'দিন বাড়িতে আছেন, সে ক'দিন সব যেন চুপচাপ। দরোয়ান 'হারুয়া, হারুয়া' বলে হাঁকডাক করতে সাহস পায় না, ফটকে গাড়িবারান্দায় গাড়ি-ঘোড়া ঢোকে বেরোয় সোয়ারি নিয়ে ধীরে ধীরে; বাবামশায়, মা, পিসি-পিসে, এ-বাড়ি ও-বাড়ির সবাই যেন সর্বদা তটস্থ। চাকর-চাকরানীদের চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি বন্ধ, সবাই ফিটফাট হয়ে ঘোরাফেরা করছে যেন ভালোমানুষটির মতো।

এই-সব দেখেশুনে কর্তার নাম হলে কেমন যেন একটু ভয়-ভয় করত। কর্তাদাদামশায়কে একবার কাছে গিয়ে দেখে নেবার লোভ, কর্তার সামনে-সামনি হয়ে তাঁর ঘরখানা দেখারও কৌতূহল থেকে থেকে জাগত মনে! কর্তার ঘরে ঢুকতে সাহসে কুলত না। কিন্তু চুপি চুপি ঘরের দিকে অনেক সময়ে এগিয়ে যেতেম। দরোয়ান সব সময়ে পেটা-ঘড়িকে পাহারা দিয়ে বসে থাকত না, সিদ্ধি ঘোঁটার সময় ছিল তার একটা। সেই একদিন-একদিন ঘড়ির সঙ্গে ভাব করতেও এগিয়ে যেতেম। পাছে ধরা পড়ি সেই ভয়ে হাতুড়ি তোলার অবসর হত না, দুই হাতে ঘড়িটাকে চাপড় কষিয়ে দিতেম। দড়িতে বাঁধা ঘড়ি লাটিমের মতো ঘুরতে থাকত, যেন একঝাঁক ভীমরুলের মতো গুমরে উঠত রেগে। ঘড়ির শব্দ আকস্মিক একটা ভয় লাগত—কর্তা বুঝি শুনলেন, দরোয়ান এল বুঝি-বা। ঘড়ির কাছে থাকা নিরাপদ নয় জেনে এক ছুটে আমাদের তিনতলার ঘরে হাজির হতেম; তার পর সারাক্ষণ যেন দেখতেম—দরোয়ান কর্তার কাছে আমার নামে নালিশ করছে; সঙ্গে সঙ্গে কর্তা ডাকলে কী কী মিছে কথা বলতে হবে তার ফর্দ একটাও তৈরি করে চলত মনে তখন।

BANGLADARSHAN.COM

কর্তামশায় সব সময়ে বাড়িতে থাকেন না—বোলপুরে যান, সিমলের পাহাড়ে যান—আবার হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না বলে ফিরে আসেন। হঠাৎ নামেন কর্তা গাড়ি থেকে ভোরে, দরোয়ানগুলো ধড়মড় করে খাটিয়া ছেড়ে উঠে পড়ে, এ-বাড়ি ও-বাড়ি সাড়া পড়ে যায়—কর্তা এসেছেন। এই সময়টায়ও দেখতেম—আমাদের বৈঠকখানায় দু'বেলা গানের মজলিস খুব আস্তে চলেছে। কাছারি বসছে নিয়মিত দশটা-চারটে। দক্ষিণের বাগানে বৈকালে বিশ্বেশ্বর হুঁকোবরদার বড়ে বড়ো রুপোর আর কাচের সটকাগুলো বার করে দেয় না। বিলিয়ার্ড-রুমে আমাদের কেদারদাদার হাঁক-ডাক একেবারে বন্ধ। যত সব গম্ভীর লোক, তাঁরা পুরোনো বাড়িতে সকাল-সন্ধ্যা আসা-যাওয়া করেন—কেউ গাড়িতে, কেউ বা হেঁটে। আমাদের উপর হুকুম আসে যেন গোলমাল না হয়, কর্তা শুনতে পাবেন। চাকরগুলো কড়া নজর রাখে—খালি পা, কি ময়লা কাপড়ে আছি কিনা। পাঠান কুস্তিগীর ক'জন খুব কষে মাটি মেখে নিয়মিত কসরত করতে লেগে যায়। বুড়ো খানসামা গোবিন্দ, সেও ভোরে ভোরে উঠে কর্তার জন্য দুধ আনতে গোয়ালঘরে গিয়ে ঢোকে।

এই গোবিন্দ ছিল কর্তার চাকর। এর একটা মজার কাহিনী মনে পড়ছে, ভোরে উঠে গোবিন্দ কর্তার জন্য দুধ নিয়ে ফিরছে, ঠিক সেই সময় পথ আগলে পাঠান সর্দার দুটো কুস্তি লাগিয়েছে। গোবিন্দ যত বলে পথ ছাড়তে, পাঠান তারা কানই দেয় না। পাঠান নড়ে না দেখে, গোবিন্দ একটু চটে উঠে অথচ গলার সুর খুব

নরম করে বলে–'পাঠান ভাই, রাস্তা ছাড়ো। শুন্‌তা, ও পাঠান ভাই। দেখ, পাঠান ভাই, কাঁদের ওপোর ছাগল নাপাতা হ্যায়, হাতে দুধের ঘট্টে হ্যায়, পড়ে যাবে তো জবাবদিহি করবে কে?'

কর্তা বাড়ি এলে বাড়ি দুটো ঢিলেঢালা ঝিমন্ত ভাব ছেড়ে বেশ যেন সজাগ হয়ে উঠত। আবার একদিন দেখতেম কর্তা কখন চলে গেছেন, বাড়ির সেই আগেকার ভাবটা ফিরে এসেছে। দরোয়ান হাঁকাহাঁকি শুরু করেছে, আমাদের ছীরে মেথরে আর বুড়ো জমাদারে বিষম তকরায় বেধেছে। জমাদার লাঠি নিয়ে যত ঝেঁকে ওঠে, ছীরে মেথর ততই নরম হয়। জমাদারের দু'পা জড়িয়ে ধরবে এমনি ভাবটা দেখায়। তখন জমাদারজী রণে ভঙ্গ দিয়ে তফাতে সরেন, ছীরেও বুক ফুলিয়ে বাসায় গিয়ে ঢুকে তার বউটাকে প্রহার আরম্ভ করে। আরো চেঁচামেচি বেধে যায়। ওদিকে দাসীতে দাসীতে ঝগড়া–তাও শুরু হয় অন্দরে। বৈঠকখানাতে গানের মজলিস জাঁকিয়ে অক্ষয়বাবু গলা ছাড়েন। আমাদেরও হুটোপুটি আরম্ভ হয়ে যায়। কর্তা না থাকলে বাঁধা চালচোল এমনি আল্‌গা হয়ে পড়ে যে, মনে হয় ঘড়িতে হাতুড়ি পিটিয়ে চললেও দরোয়ান কিছু বলবে না। কর্তার গাড়ি ফটক পেরিয়ে যাওয়া মাত্র ইস্কুল থেকে ছুটি পাওয়া গোছের হয়ে পড়ত বাড়ির এবং বাড়ির সকলের ভাবটা।

শীতকালে যেবারে কর্তাদাদামশায় বাড়ি থাকতেন সেবারে মাঘোৎসব খুব জাঁকিয়ে হত। একটা উৎসবের কথা মনে আছে একটু–সেবারে সংগীতের আয়োজন বিশেষভাবে করা হয়েছিল। হায়দারাবাদ থেকে মৌলাবক্স সেবারে জলতরঙ্গ বাজনা এবং গান করতে আমন্ত্রিত হন।

BANGLADARSHAN.COM

সকাল থেকে বাড়ি গাঁদা ফুল, দেবদারু-পাতা, লাল বনাত, ঝাড় লণ্ঠন, লোকজন, গাড়ি-ঘোড়াতে গিসগিস করছে। আমাদের মুখে এককথা–মৌলবাক্‌সোর বাজনা হবে। সকাল থেকেই খানিক সিন্দুক, খানিক বাক্‌সো মিলিয়ে একটা অদ্ভুত গোছের মানুষের চেহারা যেন চোখে দেখতে থাকলেম। এখনকার মতো তখন টিকিট হত না–নিমন্ত্রণ-পত্র চলত বোধহয়। ছেলেদের পক্ষে উৎসব-সভাতে হঠাৎ যাওয়া হুকুম না পেলেও অসম্ভব ছিল, অথচ মৌলাবাক্‌সোর গান না শুনলেও নয়। কাজেই হুকুমের জন্য দরবার করতে ছোটা গেল সকালে উঠেই। আমাদের ছোট্টখাটো দরবার শোনাতে এবং শুনে তার একটা বিহিত করতে ছিলেন ও-বাড়ির পিসেমশায়। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে সাফ জবাব পাওয়া মুশকিল হল সেদিন। 'দেখব–দেখব' বলে তিনি আমাদের বিদায় দিলেন, তার পর সারাদিন তাঁর আর উচ্চবাচ্য নেই।

উৎসবে যাওয়া কি না-যাওয়ার বিষয়ে যখন না-যাওয়াই স্থির হয়ে গেছে নিজের মনে, তখন রামলাল চাকর এসে বলল–'হুকুম হয়েছে, চটপট কাপড় ছেড়ে নাও!' এখনো টিকিটের দরবারে ছোকরাদের ও-বাড়ির দরজায় যখন ঘুরঘুর করতে দেখি তখন আমার সেই দিনটার কথাই মনে আসে!

মৌলাবাক্‌সোকে একটা অদ্ভুতকর্মা গোছের কিছু ভেবেছিলেম–জলতরঙ্গ ও কালোয়াতী গানের ভালোমন্দ বিচারশক্তি ছিলই না তখন কিন্তু মৌলাবাক্‌সো দেখে হতাশ হয়েছিলাম মনে আছে। তার চেয়ে গান-বাজনা,

লোকের ভিড়, ঝাড় লণ্ঠন, সবার উপরে তিনতলার ঘরে কর্তাদিদিমার দেওয়া গরম-গরম লুচি, ছোকা, সন্দেশ, মেঠাই-দানা, ঢের ভালো লেগেছিল আমার মনে আছে।

প্রায় পনেরো-আনা শ্রোতাই তখন মাঘোৎসবের ভোজ আর পোলাও মেঠাই খেতেই আসত আমার মতো। মস্ত মস্ত মেঠাই ছোটোখাটো কামানের গোলার মতো, নিঃশেষ হত দেখতে দেখতে। পরদিনেও আবার কর্তাদিদিমার লোক এসে একথালা মেঠাই দিয়ে যেত ছেলেদের খাবার জন্যে।

কর্তাদিদিমা আর বড়োমা–শাশুড়ী আর বউ–দু'জনেই সমান চওড়া লাল পেড়ে শাড়ি পরে আছেন। বড়োমা-র মাথায় আধহাত ঘোমটা, কিন্তু কর্তাদিদিমার মাথা অনেকখানি খোলা–সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে দেখে ভারি নতুন ঠেকছিল।

এই মাঘোৎসবে ভোজের বিরাটরকম আয়োজন হত তিনতলা থেকে একতলা। সকাল থেকে রাত একটা দুটো পর্যন্ত খাওয়ানো চলত। লোকের পর লোক, চেনা, অচেনা, আত্মপর, যে আসছে খেতে বসে যাচ্ছে। আহারের পর বেশ করে হাতমুখ ধুয়ে, পান ক'টা পকেটে লুকিয়ে নিয়ে, মুখ মুছতে মুছতে সরে পড়ছে–পাছে ধরা পড়ে অন্যের কাছে এরা সবাই। মাঘোৎসবের ভোজ আর মেঠাই, অনেকেই খেয়ে বাইরে গিয়ে খাওয়াদাওয়া ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেও চলেছে এও আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তখনকার লোকের মুখেও শুনতাম।

BANGLADARSHAN.COM

মাঘোৎসবের লোকারণ্যের মাঝখানে কর্তাকে পরিষ্কার করে দেখে নেওয়া মুশকিল ছিল আমার পক্ষে। অনেকদিন পরে একবার কর্তাদাদামশায়কে সামনা-সামনি দেখে ফেললেম। সকালবেলায় উত্তরের ফটকের রেলিঙগুলোতে পা রেখে ঝুল দিচ্ছি এমন সময় হঠাৎ কর্তার গাড়ি এসে দাঁড়াল।

লম্বা চাপকান, জোব্বা, পাগড়ি পরে কর্তা নামছেন দেখেই দৌড়ে গিয়ে প্রণাম করে ফেললেম! ভারি নরম একখানা হাতে মাথাটাকে আমার ছুঁয়েই কর্তা উপরে উঠে গেলেন।

বাড়িতে তখন খবর হয়ে গেছে–কর্তামশায় চীনদেশ থেকে ফিরেছেন। আমি যে কর্তাকে দেখে ফেলেছি, প্রণামও করেছি, সব আগেই সেটা মায়ের কানে গেল। ময়লা কাপড়ে কর্তার সামনে গিয়ে অন্যায় করেছি বলে একটু ধমকও খেলেম, আর তখনই রামলাল এসে আমাকে ধরে পরিষ্কার কাপড় ছেড়ে দিলে।

এই হঠাৎ-দেখার কিছুক্ষণ পরে, কর্তার কাছ থেকে আমাদের সবার জন্যে একটা-একটা চীনের বার্নিশ-করা চমৎকার কৌটো এসে পড়ল, তার সঙ্গে গোটাকতক বীরভূমের গালার খেলনা।

আমার বাক্সটা ছিল রুহীতনের আকার, তার উপরে একটা উড়ন্ত পাখি আঁকা। আর গালার খেলনাটা ছিল একটা মস্ত গোলাকার কচ্ছপ।

এর পরেই মা আর আমার দুই পিসির জন্যে, হাতির দাঁতের নৌকো আর সাততলা চীনদেশের মন্দির, কর্তার কাছ থেকে বাবামশায় নিয়ে এলেন। চীনের সাততলা মন্দিরটার কী চমৎকার কারিগরিই ছিল। ছোট্ট ছোট্ট

ঘণ্টা ঝুলছে, হাতির দাঁতের টবে হাতির দাঁতেরই গাছ, মানুষ সব দাঁতে তৈরি, এক-একতলায় গম্ভীরভাবে যেন ওঠানামা করছে। সেই মন্দিরের একটা-একটা তলা দেখে চলতে একটা-একটা বেলা কেটে যেত আমার। তার পর একটু বড়ো হয়ে সেটাকে টুকরো-টুকরো করে ভেঙে দেখতে লেগে গেলেম—সেদিনও মন্দিরের দু-একটা টুকরো ছিল বাক্সে।

এর পরে কর্তাকে দেখেছিলেম ছেলেবেলাতে আর-একবার। ও-বাড়ি থেকে শোভাযাত্রা করে বর বার হল—এখনকার মতো বর-যাত্রা নয়—বর চলল খড়খড়ি-দেওয়া মস্ত পাল্‌কিতে আগে ঢাক ঢোল, পিছনে কর্তাকে ঘিরে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, সঙ্গে অনেকগুলো হাতলণ্ঠন আর নতুন রঙ-করা কাপড় পরে চাকর দরোয়ান পাইক। সদর ফটক পর্যন্ত কর্তা সঙ্গে গেলেন, তার পর বরের পাল্‌কি চলে গেলে কর্তা উপরে চলে গেলেন—গায়ে লাল জমির জামেওয়ার, পরনে গরদের ধুতি।

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM